ATHENA, VOLUME X, JULY 2026 C.E. (ISSN: 2454-1605), pp. 180-187
www.athenajournalcbm.in

সিমো দ্য বোভেয়ারের দর্শনে ঋতুস্রাব: লিঙ্গ রাজনীতির এক অনালোচিত অধ্যায়

পূজা কর্মকার*

প্রাপ্ত: ১১.০২.২০২৬ পরিমার্জন: ২৪.০৩.২০২৬ গৃহীত: ২৬.০৪.২০২৬

সারসংক্ষেপ: *এই গবেষণাপত্রটি বিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট নারীবাদী দার্শনিক সিমো দ্য বোভেয়ারের 'দ্য সেকেন্ড সেক্স' (The Second Sex) গ্রন্থের আলোকে নারীর ঋতু স্বাস্থ্য এবং একে কেন্দ্র করে তার ওপর বয়ে চলা সমস্ত ধরনের সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব বিশ্লেষণ করে। বোভেয়ারের মতে, "নারী হয়ে কেউ জন্মায় না, বরং নারী হয়ে ওঠে।" এই প্রেক্ষাপটে ঋতুচক্র কেবল একটি জৈবিক প্রক্রিয়া নয়, বরং এটি নারীর 'অপরত্ব' (Otherness) নির্মাণের অন্যতম এক হাতিয়ার। বোভেয়ার ঋতুস্রাবকে নারীর অস্তিত্বের এক প্রকার 'স্থবিরতা' (Immanence) এবং প্রকৃতির দাসত্ব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যা তাকে পুরুষের মতো 'অতিক্রমণ' (Transcendence) অর্জনে বাধা দেয়। এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটিতে বোভেয়ারের ঋতুস্বাস্থ্য সম্পর্কে এই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে সমকালীন ঋতু স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং জনস্বাস্থ্যনীতির সাথে মিলিয়ে একটি নতুন সংশ্লেষণ তৈরি করার চেষ্টা করেছে। নারীর শরীরকে তার শত্রু হিসেবে না দেখে, বরং তার অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে কীভাবে নারী মুক্তি সম্ভব, তা-ই এই গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য।*

সূচক শব্দ: *ঋতু স্বাস্থ্য, প্রকৃতির দাসত্ব, অতিক্রমণ, অস্তিত্ববাদ, স্থবিরতা, জৈবিক নিয়তি।*

*অতিথি অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজ, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ।
e-mail: puja66karmakar@gmail.com

ভূমিকা

সিমো দ্য বোভেয়ার যখন ১৯৪৯ সালে 'দ্য সেকেন্ড সেক্স' প্রকাশ করেন, তখন তিনি কেবল নারীবাদের ইতিহাস পরিবর্তন করেননি, বরং নারী শরীর ও অস্তিত্বের সম্পর্ককে তিনি নতুন করে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন। তাঁর দর্শনের মূলে ছিল জঁ-পল সার্ত্রের অস্তিত্ববাদ, যেখানে 'অস্তিত্ব সারধর্মের পূর্ববর্তী' (Existence precedes essence) এটি দৃপ্ত ভাবে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে বোভেয়ার লক্ষ্য করেন যে, তার জৈবিক শরীর বিশেষ করে ঋতুচক্র, গর্ভধারণ এবং মেনোপজের মতো সাধারণ বিষয়গুলি তার স্বাধীন সত্তার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।নারীর জৈবিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে তাই বোভেয়ারের দর্শনে শরীরের ভূমিকা অত্যন্ত জটিল। যদিও তিনি মনে করেন, মানুষের শরীর কেবল একটি বস্তু নয়, বরং এটি জগতের সাথে যোগাযোগের একটি মাধ্যম। তবে এক্ষেত্রে পুরুষের শরীরকে ধরা হয় 'প্রমিত' (Standard) হিসেবে, আর নারীর শরীরকে দেখা হয় 'বিচ্যুতি' হিসেবে। ঋতু স্বাস্থ্য প্রসঙ্গে বোভেয়ার লিখেছেন যে, প্রতি মাসে নারী তার শরীরের কাছে পরাজিত হয় ঋতুস্রাব নামক প্রক্রিয়ায় আর এই রক্তক্ষরণ তার কাছে কোনো সৃজনশীলতার প্রতীক নয়, বরং প্রকৃতির এক প্রকার অন্ধ শাসনের শিকলে আবদ্ধ হওয়া। তাই এই আলোচনার মূল উদ্দেশ্যই হলো বোভেয়ারের সেই বিতর্কিত দৃষ্টিভঙ্গিকে পুনর্মূল্যায়ন করা। কেন তিনি ঋতুস্রাবকে নারী জীবনের একপ্রকার 'বোঝা' বা 'শাস্তি' হিসেবে দেখেছিলেন? –সেই বিতর্কিত বিষয়টিকেই বিশ্লেষণ করা।

গবেষণা প্রশ্ন ও গবেষণা পদ্ধতি: এই গবেষণার মূল প্রশ্নগুলি হলো—

১. 'প্রজাতির দাসত্ব' (Enslavement to the Species) ধারণার গভীরতার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা এবং দেখা যে কীভাবে ঋতুচক্র নারীর অস্তিত্বকে 'স্থবিরতা' বা Immanence-এর মধ্যে বন্দি করে রাখে।

২. ঋতুস্রাবকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সামাজিক মিথ ও ট্যাবুগুলো কীভাবে নারীকে সমাজের মূলধারা থেকে বিচ্যুত করে একজন 'অপর' (Other) সত্তায় পরিণত করে, তা উন্মোচন করা।

৩. জৈবিক সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে মাধ্যমে কীভাবে প্রজননতন্ত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে নারী তার 'জৈবিক নিয়তি' জয় করতে পারে এবং একজন স্বাধীন 'কর্তা' (Subject) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, তার পথনির্দেশ করা।

এটি একটি বিশ্লেষণাত্মক ও তাত্ত্বিক গবেষণা (Analytical and Theoretical Research)। এখানে কেবল বিদ্যমান দার্শনিক তত্ত্বকে (বোভেয়ারের 'The Second Sex'-এর উপর ভিত্তি করে) একটি সামাজিক সমস্যা তথা ঋতুস্বাস্থ্যর আলোকে পুনর্ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই গবেষণায় ফেনোমেনোলজিক্যাল অ্যাপ্রোচ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ, একজন নারী তার শরীরের ঋতুচক্রকে কীভাবে অনুভব করে এবং সেই অভিজ্ঞতা কীভাবে তার অধিকারকে তথা তাঁর সামগ্রিক অস্তিত্বকে প্রভাবিত করে, তা বোভেয়ারের বর্ণনামূলক দর্শনের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যগুলো বিশ্লেষণের জন্য 'কন্টেন্ট অ্যানালাইসিস' (Content Analysis) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে তথা বোভেয়ারের দার্শনিক যুক্তিগুলোকে মানবাধিকারের আধুনিক স্তম্ভ (মর্যাদা, সাম্য ও স্বায়ত্তশাসন)-এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়েছে। এখানে 'তাত্ত্বিক ত্রিভুজায়ন' (Theoretical Triangulation) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, যেখানে নারীবাদী দর্শন, চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং মনস্তত্ত্ব একই বিন্দুতে আনা হয়েছে। তবে এই গবেষণাটি মূলত বোভেয়ারের দর্শনের ওপর ভিত্তি করে তৈরি, তাই এতে জৈবিক ও সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যার প্রাধান্যই বেশি এবং এটি কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের পরিমাণগত পরিসংখ্যান (Quantitative Data) প্রদান করে না।

মূল আলোচনা

বোভেয়ার স্পষ্ট করে বলেছিলেন, 'Biology is not a destiny'.[১] অর্থাৎ, শরীরই নারীর শেষ কথা নয়। ঋতুস্রাব একটি প্রাকৃতিক সত্য, কিন্তু সমাজ একে যেভাবে ব্যাখ্যা করে থাকে তা একটি সাংস্কৃতিক নির্মাণে পরিণত হয়।[২] অর্থাৎ

নারীর জৈবিক নিয়তি তাই এক্ষেত্রে নারীর সামাজিক অবস্থার নির্মাণ করে দেয় (Biology as Situation)। বোভেয়ার দেখিয়েছেন যে, ঋতুচক্রের সময় নারীকে 'অশুচি'[৩] ভাবা বা তাকে মূলধারার কাজকর্ম থেকে সরিয়ে রাখা মূলত তাকে 'অপর' (The Other) হিসেবে চিহ্নিত করারই এক কৌশল। ঋতুস্বাস্থ্য তাই কেবল যে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিষয় নয়, তা আমাদের প্রথমেই বুঝে নেওয়া দরকার বরং এটি ক্ষমতার রাজনীতির সাথে খুব সুক্ষভাবে যুক্ত।

বোভেয়ারের মতে, প্রথম ঋতুস্রাব বা 'মেনার্কি' একটি মেয়ের জীবনে ট্রমা হিসেবে দেখা দেয়। কারণ, এই সময়েই সে বুঝতে পারে তার শরীর আর তার নিয়ন্ত্রণে নেই। সে সমাজের কাছে 'শিকার' (Prey) হিসেবে চিহ্নিত হতে থাকে। তিনি তাঁর বইয়ের Volume II, Part I, Chapter 3-এর Puberty অধ্যায়ে দেখিয়েছেন কীভাবে প্রথম ঋতুস্রাব একটি মেয়ের মনস্তাত্ত্বিক পরিচয়কে বদলে দেয়। তিনি বলেছেন ঋতুস্রাব শুরু হওয়ার সাথে সাথে কিশোরী বুঝতে পারে সে এখন থেকে কেবল একটি 'শরীর' বা 'প্রজনন যন্ত্র' হিসেবে সমাজের কাছে পরিচিত হবে। এটিই তার 'অন্যকরণ' বা 'Othering'-এর সূচনা।[৪] বোভেয়ারের বর্ণনায় ঋতুস্রাব হলো একটি 'সংকট', যা কিশোরীকে তার শৈশবের স্বাধীনতা থেকে বিচ্যুত করে তাকে লৈঙ্গিক পরিচয়ের ছাঁচে ফেলে দেয়। এটি বয়ঃসন্ধিকালে নারীকে তাঁর শরীরের সাথে বিচ্ছিন্নতা (Puberty and Alienation) বোধ করায়।

এক্ষেত্রে সেই বিচ্ছিন্নতাকে বয়খ্যা করতে গিয়ে সিমো দ্য বোভেয়ার তাঁর 'দ্য সেকেন্ড সেক্স' গ্রন্থে নারীর অস্তিত্বকে বিশ্লেষণ করেছেন 'স্থবিরতা' (Immanence) এবং 'অতিক্রমণ' (Transcendence) —এই দুটি বিপরীতধর্মী ধারণার অবতারণার মধ্য দিয়ে। তাঁর মতে, মানুষের প্রকৃত সার্থকতা নিহিত থাকে তার সৃজনশীল কাজ এবং নিজেকে অতিক্রম করার ক্ষমতার মধ্যে। কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে এই নীতি প্রযোজ্য নয় বরং নারীর জৈবিক শরীর, বিশেষ করে ঋতুচক্র, তাকে বারবার 'স্থবিরতা'র দিকে টেনে নামায়। এরূপ স্থবিরতা নারীর ক্ষেত্রে জীবনব্যাপী চলতেই থাকে। অন্যদিকে বোভেয়ারের মতে, পুরুষের শরীর তাকে জগতের সাথে যুক্ত হতে বাধা দেয় না, কিন্তু নারীর শরীর তাকে 'প্রজাতির' (Species) সেবায় নিয়োজিত করে। ঋতুচক্র হলো প্রকৃতির একটি পুনরাবৃত্তিমূলক প্রক্রিয়া। প্রতি মাসে নারীর শরীর প্রজননের জন্য প্রস্তুতি নেয় এবং সফল না হলে তা রক্তক্ষরণের মাধ্যমে সেই প্রক্রিয়া (ঋতুস্রাব) শেষ হয়। বোভেয়ার একেই 'স্থবিরতা' বলেছেন কারণ এই প্রক্রিয়ায় নতুন কোনো সৃষ্টি নেই, কেবল একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি আছে। নারী এখানে প্রকৃতির হাতের পুতুল মাত্র, তার শরীর যেন তার নিজের নয়, বরং প্রকৃতির এক নিজস্ব কারখানা। এই চক্রাকার প্রক্রিয়া নারীকে তার ব্যক্তিগত লক্ষ্য বা 'অতিক্রমণ' প্রক্রিয়া থেকে বিচ্যুত করে শরীরের ভেতরে বন্দি করে ফেলে। বোভেয়ারের মতে, স্পষ্টভাবেই নারী যখন ঋতুচক্রের মধ্য দিয়ে যায়, তখন সে তার শরীরের জৈবিক সীমাবদ্ধতার কাছে বন্দি হয়ে পড়ে এবং শুরু হয় নারীর প্রাকৃতিক লিঙ্গ বনাম অস্তিত্বের দ্বন্দ্ব। তিনি একেই 'ইমানেন্স' বা স্থবিরতা বলেছেন, যেখানে পুরুষ তার কাজের মাধ্যমে নিজেকে অতিক্রম করে (Transcendence), সেখানে নারী তার শরীরের চক্রাকার জৈবিক প্রক্রিয়ায় আটকে থাকে। এই জৈবিক-মনস্তাত্ত্বিক সংকটই নারীর ঋতু স্বাস্থ্যকে একটি প্রান্তিক বিষয়ে পরিণত করেছে বলে তাঁর অভিমত।

নারীর 'অপর' হয়ে ওঠা

বোভেয়ারের মতে, ঋতুস্রাব নারীকে কেবল পুরুষের কাছেই 'অপর' করে না, বরং নিজের শরীরের কাছেও তাকে অচেনা বা 'অপর' করে তোলে। প্রতি মাসে শরীর থেকে রক্তক্ষরণ হওয়া এবং এর সাথে জড়িত শারীরিক যন্ত্রণাকে নারী অনেক সময় তার নিজের অস্তিত্বের বাইরের কোনো 'শত্রু' হিসেবে দেখে। সাধারণভাবে একজন স্বাধীন মানুষ তথা কর্তা (Subject) হিসেবে নারী তার শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, কিন্তু ঋতুস্রাব তাকে বারবার বাধ্য করে তার শরীরের কাছে আত্মসমর্পণ করতে তথা প্রকৃতির এই দাসত্ব মেনে নিতে। আর এই অসহায়ত্ব তাকে তার 'জৈবিক কর্তৃত্ব' থেকে বিচ্যুত করে একটি ' অধীন বস্তু' বা 'Object'-এ পরিণত করে।[৫]

শুধু তাই নয়, ঋতুস্রাব কীভাবে নারীকে 'অপর' (The Other) করে তোলে? —এ প্রশ্নের উত্তর বোঝা সম্ভব সমাজে

নারীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা মিথ ও অশুচিতার লিঙ্গ রাজনীতি দিয়ে। তাঁর মতে, ঋতুস্রাবের গোপনীয়তার নির্মাণ নারীর অপর হয়ে ওঠাকে আরও নিশ্চিত করে তোলে। কারণ, এই ঋতুস্রাবই সমাজে পুরুষকে 'কর্তা' (Subject) এবং নারীকে অপর (Object) হিসেবে দেখতে বাধ্য করে। ঋতুস্রাব যেহেতু কেবল নারীর সাথে ঘটে, তাই পুরুষশাসিত সমাজ একে রহস্যময় এবং ভীতিকর বিষয় হিসেবে কল্পনা করে তথা সুকৌশলে প্রচার করে। সাধারণত মুলস্রোতের গণপরিসরের আলোচনায় ঋতুস্বাস্থ্য নিয়ে কোনো খোলামেলা আলোচনা সমাজে হয় না, ফলে সমাজ ঋতুস্রাবকে একটি 'লজ্জার' বা 'গোপন'[৬] বিষয় হিসেবে দাগিয়ে দিয়ে এটিকে নারীর একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় রূপে নির্মাণ করেছে। এই পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া নারীকে সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।ঠিক যেমন, ধর্মীয় বা সামাজিক প্রথায় ঋতুস্রাব চলাকালীন নারীকে 'অশুচি' মনে করে আলাদা করে রাখা হয়। এইভাবে যখন কোনো প্রাকৃতিক –স্বাভাবিক এক প্রক্রিয়াকে 'অশুচি' বলা হয়, তখন যার শরীরে সেটি ঘটছে তাকে 'স্বাভাবিক মানুষের' শ্রেণি থেকে আলাদা করে দেওয়া হয় এবং এই আলাদাকরণ লিঙ্গ রাজনীতিরই এক জলন্ত রূপ। সে তখন আর সবার মতো 'একজন' থাকে না, বরং সে হয়ে ওঠে এক 'রহস্যময় অন্য কেউ'।[৭] বোভেয়ার মনে করতেন, এই সামাজিক গোপনীয়তাই নারীর হীনম্মন্যতার মূল কারণ।

লজ্জার সংস্কৃতি

তিনি তাঁর গ্রন্থের Volume I, Part III, Chapter 1: Myths অংশে ঋতুস্রাবকে ঘিরে চলতে থাকা সামাজিক কুসংস্কারের রাজনৈতিক দিকটিকে উন্মোচন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, ঋতুস্রাবকে 'অশুচি' বা 'অপবিত্র' প্রমাণ করার এই রাজনৈতিক কৌশলটি বাস্তবে নারীকে মন্দিরে, রান্নাঘরে বা গুরুত্বপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রেখে তাকে পুরুষের অধীনস্থ রাখার ব্যবস্থা করে।সমাজ ঋতুস্রাবকে উপস্থাপন করে একটি 'লজ্জার সংস্কৃতি (The Culture of Shame)[৮] হিসেবে। আর এই সংস্কৃতি পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বয়াবহারিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় তখন; যখন আমরা দেখি, দোকানে ন্যাপকিন কেনার সময় কালো প্যাকেটে মুড়িয়ে দেওয়া বা পিরিয়ড চলাকালীন রান্নাঘর বা মন্দিরে প্রবেশে নিষেধ করা হয়। এই আচরণগুলো নারীকে প্রত্যক্ষভাবে নির্দেশ করে যে তার শরীর 'স্বাভাবিক' (যেমন পুরুষ শরীর) নয়। এইভাবে পুরুষ শরীরকে 'পবিত্র' বা 'প্রমিত', আর নারীর শরীরকে 'ত্রুটিপূর্ণ' বা 'অশুচি' হিসেবে সমাজ নির্মাণ করে দেয়।[৯] এই নির্মাণই নারীকে সমাজে 'The Other' বা 'দ্বিতীয় শ্রেণি'-র (second sex) নাগরিকে পরিণত করে।[১০]

অপরদিকে আবার এই অন্যকরণ প্রক্রিয়া চলে তখন, যখন আমরা দেখি, কর্মক্ষেত্রে যখন ঋতুস্বাস্থ্যের কথা ভাবা হয় না, এক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে এই বার্তাই দেওয়া হয় যে এই জগতটি মূলত তাদের জন্য যাদের ঋতুস্রাব হয় না (অর্থাৎ পুরুষ)। সাথে এই প্রশ্নও উঠে আসতে থাকে, যেহেতু নারী প্রকৃতিগত ভাবেই আনইকুয়াল বা জৈবিকভাবে দুর্বল তাই সামাজে নারীর সমানাধিকার দাবি করার প্রসঙ্গটি একেবারে অমূলক একটি বিষয়।[১১] এর ফলে নারীকে সবসময় এই পুরুষতান্ত্রিক জগতে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে লড়াই করতে হয়, যা তাকে বারবার মনে করিয়ে দেয় যে, সে এই জগতের 'মূল অংশ' নয়, বরং সে একজন 'আগন্তুক' বা 'অন্য'।

প্রজাতির দাসত্ব

প্রকৃতির এই নির্মম বিচারকে সিমো দ্য বোভেয়ার 'প্রজাতির দাসত্ব' (Enslavement to the Species) হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ধারণাটি তাঁর অন্যতম প্রধান এবং বিতর্কিত আলোচনার বিষয়। বোভেয়ার এখানে ব্যাখ্যা করেছেন যে, কীভাবে প্রকৃতি বা জৈবিক সত্তা নারীকে তাঁর ব্যক্তিগত অস্তিত্বের চেয়ে 'প্রজাতির ধারাবাহিকতা'-র রক্ষক হিসেবে বেশি ব্যবহার করে। 'দ্য সেকেন্ড সেক্স' (The Second Sex) গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের (Biological Data) প্রথম লাইনে তিনি নারীকে সংজ্ঞায়িত করেছেন— Woman? Very simple, say those who like simple answers: she is a womb, an ovary; she is a female: this word is enough to define her. (p. 21) অর্থাৎ সমাজ নারীকে প্রজাতির বাহক হিসেবেই তাচ্ছিলের সুরে সংজ্ঞায়িত করে থাকে।

সাধারণভাবে, মানুষ হলো একটি 'সচেতন সত্তা' (Subject), যার লক্ষ্য হলো নিজের জীবনের উদ্দেশ্য তৈরি করা এবং সেই লক্ষ্য পূরণের জন্য জগতকে নিজের মতো করে গড়ে তোলা। কিন্তু সিমো দ্য বোভেয়ার লক্ষ্য করেন, নারীর ক্ষেত্রে এই স্বাধীন সত্তা বা 'Subjectivity' অর্জনের পথে বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়ায় তার নিজস্ব জৈবিক শরীর। তিনি এক্ষেত্রে মনে করেন, মানুষের মধ্যে দুটি সত্তা বর্তমান থাকে প্রথম হলো তাঁর ব্যক্তিগত চেতনা (Individual consciousness) এবং অন্যটি তার জৈবিক শরীর (Biological organism)। মানুষ সর্বদা চাই তাঁর জৈবিক সত্তাকে অতিক্রম করে নিজের পরিচিতি তথা ব্যক্তিগত চেতনার স্তরে পৌছতে। কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে এই দ্বিতীয় সত্তাটি অর্থাৎ জৈবিক শরীরটি প্রায়ই ব্যক্তিগত চেতনাকে ছাপিয়ে যায়। একেই তিনি 'প্রজাতির দাসত্ব' বলেছেন। বোভেয়ারের মতে, প্রকৃতি কোনো একক ব্যক্তির (Individual) সুখ বা স্বাধীনতার পরোয়া করে না; প্রকৃতির একমাত্র লক্ষ্য হলো জীবনকে টিকিয়ে রাখা বা প্রজাতির বংশবিস্তার নিশ্চিত করা। এই নিয়ম পুরুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় তার জৈবিক ভূমিকার (শুক্রাণু উৎপাদন) দ্বারা, যা তার শরীরের ওপর খুব একটা প্রভাব ফেলে না বা তার প্রাত্যহিক কাজে বাধা সৃষ্টি করে না। কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে, তার প্রজননতন্ত্র অর্থাৎ ঋতুচক্র, গর্ভধারণ এবং সন্তান জন্মদান –এগুলি তার শরীরের জীবনীশক্তি শোষণ করে নেয়।[১২]

বিষয়টিকে ভেঙে বললে, বভেয়ারের দর্শনে 'প্রজাতি রক্ষা' বলতে বোঝানো হয়েছে মানবজাতির ধারাবাহিকতা রক্ষার জৈবিক প্রক্রিয়াকে আর প্রকৃতি নারীকে ব্যক্তিগতভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ প্রদানের চেয়ে 'বংশরক্ষার মাধ্যম'[১৩] হিসেবে বেশি ব্যবহার করে। একজন পুরুষের প্রজনন ক্ষমতা তার প্রতিদিনের কাজে বা অস্তিত্বে বড়ো কোনো বাধা সৃষ্টি করে না। কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে, তার প্রজননতন্ত্র তাকে প্রতি মাসে ঋতুচক্রের মধ্য দিয়ে যেতে বাধ্য করে। তাই, বোভেয়ার অত্যন্ত কঠোরভাবে বলেছেন, "নারী হলো প্রকৃতির শিকার" (Woman is the prey of the species)। অর্থাৎ, প্রকৃতি নারীকে তার নিজস্ব কোনো লক্ষ্যের জন্য নয়, বরং পরবর্তী প্রজন্মকে জন্ম দেওয়ার জন্য একটি 'যন্ত্র' বা 'আধার' হিসেবে ব্যবহার করে এবং এক্ষেত্রে বোভেয়ার ঋতুস্রাবকে 'প্রজাতির দাসত্ব'-এর প্রথম এবং সবচেয়ে নিয়মিত প্রমাণ হিসেবে দেখেছেন। তিনি একে নারী জীবনের একটি 'সংকট' বা প্রতিবন্ধকতা (Crisis) হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কারণ, প্রতি মাসে নারীর শরীর একটি সম্ভাব্য সন্তান ধারণের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে। জরায়ুর দেওয়াল পুরু হয়, হরমোনের পরিবর্তন ঘটে এবং যখন গর্ভধারণ হয় না, তখন সেই প্রস্তুতি ধ্বংস হয়ে যায় এবং রক্তক্ষরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। তাঁর মতে, এই প্রক্রিয়ায় নারীর শরীরের কোনো লাভ নেই, বরং সে দুর্বল হয়, রক্তাল্পতায় ভোগে এবং যন্ত্রণার শিকার হয়।অন্যদিকে সমাজ যেভাবে মাতৃত্বকে প্রকৃতির সবচেয়ে সৃজনশীল কাজ হিসেবে নির্মাণ করে[১৪] সেটি আসলে কোনো সৃজনশীল কাজের ফল নয়, বরং এটি একটি জৈবিক আবশ্যকতা যা নারীর ইচ্ছার বাইরে ঘটে। ফলত, এখানে নারী তার শরীরের কাছে পরাজিত হয়, যা তাকে 'স্থবিরতা' (Immanence)-র মধ্যে আটকে রাখে।

স্থবিরতা' হলো এমন এক অবস্থা যেখানে মানুষ নতুন কিছু না করে কেবল পুরনো অভ্যাসে আটকে থাকে। অন্যদিকে তুলনামূলক বিচারে পুরুষের জীবন সাধারণত 'রৈখিক' (Linear)[১৫]; সে জীবনের এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে সহজেই এগিয়ে যায়। 'The Mother' অধ্যায়ে তাই বোভেয়ার ঋতুস্রাবকে নারী জীবনের 'চক্রাকার স্থবিরতা' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, পুরুষের জীবন একটি রৈখিক গতিতে চলে (Linear progress), কিন্তু ঋতুচক্র নারীকে বারবার একই জায়গায় ফিরিয়ে আনে। এই চক্রাকার পুনরাবৃত্তি তাকে ইতিহাসের বড়ো পরিবর্তনের কাজে (Historical projects) বাধা দেয়। উদাহরণ হিসেবে একজন নারী, যিনি একজন বিজ্ঞানী হিসেবে একটি গবেষণায় কাজে যুক্ত কিন্তু ঋতুস্রাবকালীন তীব্র যন্ত্রণা বা হরমোনের পরিবর্তন তাকে বাধ্য করে তার সেই সৃজনশীল কাজ থেকে সরে এসে নিজের শরীরের কষ্টের দিকে মনোযোগ দিতে। বভেয়ারের দৃষ্টিতে, এখানে প্রকৃতি নারীর ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষাকে পরাজিত করে তাকে তার শরীরের 'দাসে' পরিণত করছে।

ফলে ঋতুস্রাব নারীর জীবনকে 'চক্রাকার' (Cyclical) করে তোলে আর প্রতি মাসে সে যেখান থেকে শুরু করেছিল, ঠিক সেখানেই ফিরে আসে। যেমন প্রতি মাসে ঋতুস্রাবের আগে ও পরে নারীর শরীর যে হরমোনাল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়, তা তাকে মানসিকভাবে ক্লান্ত করে।ফলে, এই পুনরাবৃত্তিমূলক জৈবিক প্রক্রিয়া তাকে বড়ো কোনো দীর্ঘমেয়াদী কাজ করার ক্ষেত্রে শারীরিক ও মানসিকভাবে পিছিয়ে দেয়। বভেয়ার মনে করতেন, এই চক্রটিই নারীকে সমাজের মূলধারা থেকে পিছিয়ে চিরকাল 'স্থবির' করে রাখে।

বোভেয়ারের দর্শনে গর্ভাবস্থা হলো প্রজাতির দাসত্বের চরম পর্যায়। তিনি বলেছেন যেখানে প্রতি মাসে শরীর যে প্রস্তুতি প্রজননের জন্য যা তাকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা 'Transcendence' থেকে বিচ্যুত করে। তিনি গর্ভাবস্থাকে কোনো 'অলৌকিক মহিমা' হিসেবে দেখেননি, বরং একে দেখেছেন নারীর শরীরকে একটি 'বস্তু' হিসেবে ব্যবহারের প্রক্রিয়া হিসেবে।বাস্তবে গর্ভাবস্থায় নারীর ব্যক্তিগত 'অতিক্রমণ' (Transcendence) বা বাইরের জগতের কাজ বাধাগ্রস্ত হয়। সে তখন কেবল প্রকৃতির একটি 'হাতিয়ার'-এ পরিণত হয়[১৬], যেখানে তার নিজের ইচ্ছা বা স্বাধীনতা প্রকৃতির বংশবিস্তারের লক্ষ্যের কাছে গৌণ হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে, বোভেয়ার কেন নারীকে ' প্রজাতির দাস' বললেন? পুরুষও তো জৈবিক নিয়মে প্রজননের জন্য সমানভাবে দায়ী! তাহলে অসুবিদধা ঠিক কোথায় তা বুঝতে পুরুষের সাথে নারীর প্রজনন ভূমিকার তুলনা করা জরুরি। পুরুষের যৌন ক্ষমতা বা প্রজনন ক্ষমতা তার শারীরিক শক্তির সাথে মিলেমিশে থাকে তথা সে যখন বংশবিস্তারে ভূমিকা রাখে, তখন তার শরীরে কোনো দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তন বা স্থবিরতা আসে না। পুরুষের ক্ষেত্রে তার শরীর তার কর্মের (Action) অনুসারী। কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে, তার শরীর তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। ঋতুস্রাবের অস্বস্তি বা গর্ভাবস্থার ক্লান্তি তাকে জগতের কাজ থেকে সরিয়ে নিজের শরীরের ভেতরে নিবিষ্ট হতে বাধ্য করে। একেই বোভেয়ার বলেছেন 'বিচ্ছিন্নতা' (Alienation from self), যেখানে নারী নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রজাতির দাসে পরিণত হয়।

বোভেয়ার কিন্তু কেবল জীববিদ্যার ওপরই দোষ চাপাননি বরং তিনি বলেছেন, সমাজ এই জৈবিক বাস্তবতাকে তথা মাতৃত্বকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে নারীকে ঘরে বন্দি করে রাখে তথা তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় তাঁর নিজস্ব সত্ত্বা থেকে। যেহেতু নারীর শরীর ঋতুচক্র বা প্রজননের কারণে কিছুটা 'অস্থির অবস্থার' মধ্য দিয়ে যায়,[১৭] তাই সমাজ ধরে নেয় নারী গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম। এককথায়, এই 'প্রজাতির দাসত্ব'-ই নারীকে অযোগ্য বা অক্ষম হিসেবে অনুমান করে নিতে বাধ্য করে।

বোভেয়ারের দর্শনের শেষ কথা হলো শরীর আমাদের পরিস্থিতি (Situation), কিন্তু এটি আমাদের নিয়তি (Destiny) নয়। তাই ঋতুচক্রের কারণে নারী স্থবিরতায় আটকে থাকবে কি না, তা নির্ভর করে সমাজের পরিকাঠামোর ওপর। যদি সমাজ ঋতুস্রাবকে 'অশুচি' বা 'অসুস্থতা' হিসেবে দেখে, তবে নারী স্থবির হয়ে পড়ে। কিন্তু যদি একে একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবে গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়, তবে নারী তার স্থবিরতা জয় করে একজন 'কর্তা' (Subject) হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। বোভেয়ারের মতে, নারী যদি কেবল তার জৈবিক শরীরের ওপর নির্ভর করে বাঁচে, তবে সে সবসময় 'প্রজাতির দাস' হয়েই থাকবে। কিন্তু যদি সে তার শিক্ষা, কাজ এবং সৃজনশীলতার মাধ্যমে এই জৈবিক চক্রকে জয় করতে পারে, তবেই সে 'মুক্ত মানুষ' বা 'Subject' হতে পারবে।[১৮] ঋতু স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা এবং এর সঠিক প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা নারীকে তার শরীরের এই 'স্থবিরতা' থেকে রক্ষা করে তাকে বৃহত্তর জগতের কাজে যুক্ত হওয়ার সুযোগ দেয়।

সিমো দ্য বোভেয়ারের দর্শনে নারীর ঋতু স্বাস্থ্য একটি ট্র্যাজিক কিন্তু তা নারীর জীবনের অনিবার্য বাস্তবতা। যদিও তিনি ঋতুস্রাবকে কিছুটা নেতিবাচকভাবে দেখেছেন, তবুও তাঁর মূল বার্তা ছিল নারীর স্বায়ত্তশাসন। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বোভেয়ারের দর্শন আমাদের শেখায় যে, ঋতুস্রাব যেন নারীর প্রগতির পথে বাধা না হয়, বরং রাষ্ট্র ও সমাজের দায়িত্ব হলো এমন এক পরিবেশ তৈরি করা যেখানে নারী তার শরীরের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে সম্মান জানিয়েই মহাজাগতিক বা সামাজিক কর্মযজ্ঞে শামিল হতে পারে। প্রসঙ্গত, ঋতু স্বাস্থ্যের অধিকার নিশ্চিত করাই হলো বোভেয়ারের আকাঙ্ক্ষিত 'স্বাধীন নারী' গড়ে তোলার প্রথম ধাপ আর তাই সিমো দ্য বোভেয়ার নারীর এই 'জৈবিক দাসত্ব' এবং 'অপরত্ব'

(Otherness) থেকে মুক্তির একটি সুনির্দিষ্ট রূপরেখাও দিয়েছেন। তাঁর মতে, এই মুক্তি কেবল ইচ্ছাশক্তির বিষয় নয়, বরং এটি একটি রাজনৈতিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত লড়াই।

বোভেয়ারের দর্শনে নারীর এহেন অবস্থা থেকে মুক্তির প্রধান পথগুলো নিচে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো—

১. **অর্থনৈতিক স্বাধীনতা:** যা হলো নারী মুক্তির মূল ভিত্তি, বোভেয়ার অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা ছাড়া নারীর মুক্তি অসম্ভব। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে, যতক্ষণ নারী অন্ন-বস্ত্রের জন্য পুরুষের ওপর নির্ভরশীল থাকবে, ততক্ষণ সে নিজের অস্তিত্বের মালিক হতে পারবে না। কারণ যখন একজন নারী নিজের অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হয়, তখন সে আর কেবল 'কারো স্ত্রী' বা 'কারো মা'[১৯] হিসেবে সংজ্ঞায়িত হয় না। সে তখন একজন 'কর্তা' (Subject) হিসেবে নিজের আত্ম পরিচয় তৈরি করতে পারে। এটি তাকে 'স্থবিরতা' (Immanence) থেকে বের করে বাইরের কর্মমুখর জগতের 'অতিক্রমণ' (Transcendence)-এর দিকে নিয়ে যায়।

২. **শরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও বিজ্ঞান: বোভেয়ার** মনে করতেন, প্রকৃতি নারীকে যে জৈবিক সীমাবদ্ধতা দিয়েছে, তাকে জয় করতে হবে বিজ্ঞানের মাধ্যমে। তিনি গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা (Contraception) এবং নিরাপদ গর্ভপাতের অধিকারের পক্ষে জোরালো সওয়াল করেছেন। তাঁর মতে, নারী যখন তার প্রজননতন্ত্রের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পাবে, তখনই সে 'প্রজাতির দাসত্ব' থেকে মুক্তি পাবে। সঠিক ঋতু স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা নারীকে তাঁর শরীরের 'চক্রাকার স্থবিরতা' থেকে মুক্তি দেয়।

৩. **শিক্ষাগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ:** বোভেয়ারের মতে, নারীকে পুরুষের সমান্তরালে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। কেবল ঘরোয়া শিক্ষা নয়, বরং এমন শিক্ষা যা তাকে জগতকে প্রশ্ন করতে এবং বিনির্মাণ করতে শেখাবে। এই শিক্ষা নারীকে বুঝতে সাহায্য করে যে, তার 'অপরত্ব' কোনো ঈশ্বরপ্রদত্ত বা প্রাকৃতিক বিষয় নয়, বরং এটি একটি সামাজিক নির্মাণ। যখন নারী নিজের ইতিহাস ও পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হয়, তখন সে তার 'ফ্যাক্টিসিটি' (Facticity) বা সীমাবদ্ধতাগুলোকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে।[২০]

৪. **সমাজিক রূপান্তর ও রাষ্ট্রীয় ভূমিকা:** বোভেয়ার মনে করতেন, নারীর মুক্তি কেবল ব্যক্তিগত স্তরে সম্ভব নয়; এর জন্য গোটা সমাজের কাঠামো তথা পিতৃতন্ত্রের পরিবর্তন দরকার।রাষ্ট্র তথা জনপ্রশাসন যখন ঋতু স্বাস্থ্যের মতো বিষয়গুলোকে নারীর 'ব্যক্তিগত সমস্যা' না ভেবে 'সরকারি নীতি'-র অন্তর্ভুক্ত করবে, তখনই বোভেয়ারের কাঙ্ক্ষিত নারী মুক্তির ধারণা ত্বরান্বিত হবে।

৫. **'আত্মপ্রবঞ্চনা' ত্যাগ করা:** বোভেয়ার মনে করতেন, অনেক নারী নিজেই নিজের স্বাধীনতাকে ভয় পায়। সমাজ নারীকে যে 'নিরাপদ' গণ্ডি বা 'আদর্শ নারী'র ছাঁচ দেয়, তাতে আটকে থাকাকে তিনি 'Bad Faith' বা আত্মপ্রবঞ্চনা বলেছেন।[২১] এক্ষেত্রে মুক্তির পথ হলো এই ছাঁচ ভেঙে বেরিয়ে আসা এবং নিজের জীবনের অর্থ নিজেই তৈরি করা। নারীকে বুঝতে হবে যে, সে কেবল 'প্রকৃতির বাহক' নয়, সে একজন স্বাধীন মানুষ। এই মানসিক রূপান্তরই হলো নারী মুক্তির প্রথম ধাপ।

সবশেষে তিনি বলেন নারী মুক্তি হলো পুরুষ ও নারীর যৌথ সংগ্রাম।পুরুষকে শত্রু ভাবা নারী মুক্তির পথ নয় বরং পুরুষ ও নারী উভয়কেই এই পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো থেকে বের হতে হবে। তিনি লিখেছেন যে, যখন পুরুষ ও নারী একে অপরকে সমমর্যাদার 'কর্তা' (Subject)[২২] হিসেবে স্বীকৃতি দেবে, তখনই মানুষের মধ্যে প্রকৃত মানবিকতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

সুত্রনির্দেশ:

১. Beauvoir, Simone de. (2011). *The Second Sex* (Trans. Constance Borde and Sheila Malovany-Chevallier), Vintage Books, p. 21.

২. Young, Iris Marion. (2005). *On Female Body Experience: Throwing Like a Girl and Other Essays,* Oxford University Press, p. 98.
৩. বিশ্বাস, সুকান্ত, (২০২০), *পবিত্র ঋতুস্রাব ও সামাজিক ছুৎমার্গ*, গ্রন্থমিত্র, পৃ. ৯৭।
৪. *তদেব*, পৃ. ১০০।
৫. *তদেব*, পৃ. ১০৩।
৬. *তদেব*, পৃ. ১০৮।
৭. মণ্ডল, মানস। (২০২১), *নারীবাদী তত্ত্ব*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, পৃ. ১৪৪।
৮. *তদেব*, পৃ. ১৪৮।
৯. *তদেব*, পৃ. ১৫২।
১০. *তদেব*, পৃ. ১৫৫।
১১. সেনগুপ্ত, মল্লিকা। (২০২০), *স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ,* আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ৪৮।
১২. *তদেব*, পৃ. ৫০।
১৩. *তদেব*, পৃ. ৫৪।
১৪. *তদেব*, পৃ. ৫৮।
১৫. মুখোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা ও বন্দ্যোপাধ্যায়, অপর্ণা (সম্পা.), (২০১৮), *নহি সামান্য নারী*, সেতু প্রকাশন, পৃ. ৫৬৪।
১৬. *তদেব*, পৃ. ৫৬৭।
১৭. *তদেব*, পৃ. ৫৬৯।
১৮. *তদেব*, পৃ. ৫৭১।
১৯. মৈত্র, শেফালি, (২০০৩), *নৈতিকতা ও নারীবাদ*, নিউ এজ পাবলিশার্স, পৃ. ৫৩।
২০. *তদেব*, পৃ. ৬০।
২১. *তদেব*, পৃ. ৬৭।
২২. *তদেব*, পৃ. ৮২।